স্বাধীনতা দিবস, মহাত্মা গান্ধী ও কলকাতার চমফকারিত্ব

সুপ্রিয় মুন্সী

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার অন্যতম স্থপতি মহাত্মা গান্ধী সেদিন কোথায় ছিলেন, কিভাবে দিনটি অতিবাহিত করেছিলেন তা আজকের প্রজন্মের অনেকেরই হয়ত জানা নেই। পূর্ব্ব কলকাতার বেলিয়াঘাটা বা বেলেঘাটায় 'আলোছায়া' সিনেমার অদূরে বেলেঘাটা মেন্ রোড ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোডের সংযোগস্থল থেকে একটু দক্ষিণ দিকে একটি পোড়ো মুসলিম বাড়িতে সেই সময়ে গান্ধীজী বাস করছিলেন ও ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ স্বাধীনতা দিবসটি অনশন ও মৌন অবলম্বন করে অতিবাহিত করেন। কারণ এই রকম স্বাধীনতা অর্থাৎ দ্বিখন্ডিত ভারতবর্ষ তিনি বা আপামর স্বাধীনতা সংগ্রামী চাননি। স্বভাবতই দিল্লীতে যখন আলোর রোশনাই ও উৎসব পালিত হচ্ছে তিনি তখন অনেক দূরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত কলকাতায় শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টায় মগ্ন রয়েছেন। আরও একজন বিখ্যাত মানুষ ঐদিন কলকাতায় তাঁর ১ নং উড্‌বার্ণ পার্কের বাড়িতে অনশনরত ছিলেন তিনি ভারত-স্বাধীনতা যুদ্ধের আর এক কান্ডারী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়। 'যুক্ত বাংলা' গঠনের একটি পরিকল্পনা করে 'বঙ্গভঙ্গ' রোধ করে স্বাধীন বঙ্গের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সে আর এক কাহিনী।

১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে গ্রেট 'ক্যালকাটা কীলিং'-এর সুযোগ নিয়ে তৎকালীন পূর্ব্ববঙ্গে নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যালঘুদের ওপরে ভয়াবহ, জঘন্যতম দাঙ্গা সংগঠিত করে। এই খবর দিল্লী পৌঁছানো মাত্র মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালি যাত্রা স্থির করেন ও দাঙ্গা প্রশমন শান্তি স্থাপন ও ভীতদের মন থেকে ভয়ভাব দূর করা এবং পুনর্বাসনের জন্য কলকাতার অদূরে সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান হয়ে ১৯৪৬ সালের ৬ই নভেম্বর নোয়াখালি যাত্রা করেন। প্রায় চার মাস ধরে পায়ে হেঁটে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে ১৯৪৭ সালের ৩রা মার্চ কলকাতা হয়ে তিনি বিহার যাত্রা করেন। কারণ বিহারে নোয়াখালির প্রতিশোধ নেওয়া চলছিল। পরে ৯ই মে আবার দিল্লী থেকে কলকাতা আসেন নোয়াখালি যাবার জন্য। কিন্তু কোলকাতায় আবার দাঙ্গা দেখা দেওয়ায় এখানেই কিছুদিন থেকে যান। পরে পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে দাঙ্গা-পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় দিল্লী হয়ে তিনি কাশ্মীর ও লাহোর যান। পৃথিবীর ইতিহাসে সাতাত্তর বৎসরের এক বৃদ্ধ মানুষের মনের পরিবর্তন করে শান্তি ও ঐক্য স্থাপনের জন্য এক বিশাল দৌত্য পূর্ব থেকে পশ্চিম ও আবার পশ্চিম থেকে পূর্বে ছুটে চলা আর দেখা যায়নি।

১৯৪৭ সালের ৯ই আগস্ট আবার গান্ধীজী কলকাতায় আসেন নোয়াখালি যাবার জন্য। কারণ ঐখানে তাঁর কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার দিন আগত হওয়ায় ও ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ায় এখানকার মুসলিম নেতৃবৃন্দ অশঙ্কিত হন ও গান্ধীজীকে কলকাতায় ঐ সময়ে থাকার অনুরোধ করেন। গান্ধীজী মনে করেছিলেন যে কলকাতায় হিন্দু সম্প্রদায় যদি সংযত থাকে তবে হয়ত নোয়াখালিতে মুসলমানরাও সংযত হবে। এর পরেই ১২ই আগস্ট বেলেঘাটার দরিদ্র মুসলিম অধ্যুষিত ঐ বাড়িটি নির্বাচন করা হয়, জীর্ণ বাড়িটিকে যথাসাধ্য বাসযোগ্য করা হয় ও গান্ধীজী এটিকে মঞ্জিল বলে চিহ্নিত করেন। বর্তমানে এটি বেলিয়াঘাটা গান্ধীভবন বলে পরিচিত। তিনি দুটি শর্ত আরোপ করেন - প্রথমতঃ ঐখানকার মুসলিম অধিবাসীরাই তাঁর দেখাশোনা করার ভার নেবেন। তা যেরূপই হোক ও দ্বিতীয়তঃ দাঙ্গায় সুরাবর্দ্দীকে তাঁর সঙ্গে থাকতে হবে। ১৯৪৬-এ কলকাতায় যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয় তার জন্য সুরাবর্দ্দী মহাশয় তাঁর দায়িত্ব এড়াতে পারেননি। ঐদিন সন্ধ্যা বেলাতেই একটি বড় দল জমায়েত হয়ে গান্ধীজীকে প্রশ্ন করেন যে ১৯৪৬ সালের অক্টোবরে যখন কলকাতা জ্বলছিল তখন তিনি আসেননি কেন? স্বাধীনতা দিবসের পূর্ব্বদিন অর্থাৎ ১৪ই আগস্ট প্রার্থনা সভায়

সন্ধ্যাবেলা দশ হাজারেরও ওপর মানুষের জমায়েতে গান্ধীজী বলেন যে আগামীকাল হর্ষ ও বিষাদের দিন। কারণ স্বাধীনতা যেমন আসছে তেমনি দেশও দ্বিখন্ডিত হচ্ছে এবং সেইভাবেই সংযত থেকে দিনটি পালিত হোক।

১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ স্বাধীনতার দিন কলকাতায় অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই' স্লোগানে আকাশ মুখরিত হয়। গান্ধীজীকে বিকাল বেলায় তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ সব ঘুরিয়ে দেখান। আগেই বলা হয়েছে যে গান্ধীজী ঐদিন অনশন ও মৌন অবলম্বন করে দিনটি অতিবাহিত করেন। ভারত সরকারের তথ্য বিভাগ তাঁর বাণী চাইলে তিনি লিখে দেন 'আমি শুকিয়ে গেছি' এবং ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন অর্থাৎ বি.বি.সি.-কে লেখেন আমি 'ইংরাজী ভুলে গেছি'।

কিন্তু কলকাতা শান্ত থাকলেও মফস্বলে বিভিন্ন স্থানে ১৮ই আগস্ট থেকে দাঙ্গা প্রচেষ্টা হয় এবং গান্ধীজীকে ১০/১১ আগস্ট পর্যন্ত বারাকপুর, টিটাগড়, কাঁচড়াপাড়া, বারাসাত, প্রভৃতি স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

৩১শে আগস্ট রাত্রিবেলা বেলেঘাটার বাড়ির সামনে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের একটি বড় দল জমায়েত হয় ও মাথায় ফেট্টি বাঁধা একজনকে এনে দেখায় যে মুসলিমরা তাকে আঘাত করেছে। সেইখানে তখন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষ ছিলেন ও তিনি লোকটিকে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন যে এটি এমনিই লাগানো হয়েছে। সেই সময়ে গান্ধীজীকে লক্ষ্য করে লাঠি ও ইঁট ছোঁড়া হয়। কলকাতা আবার দাঙ্গার কবলে পড়ে।

<u>কলকাতার চমফকারিত্ব :</u>

এই ঘটনার পরে ঐ দিন রাত্রি ১১টায় গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে তিনি ১লা সেপ্টেম্বর শুরু হবার সঙ্গ সঙ্গে আমরণ অনশন করবেন ও কলকাতা সম্পূর্ণভাবে শান্ত হলেই তিনি অনশন ভঙ্গ করবেন। নেতা ও মানুষদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায় এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর বোমা, অস্ত্রশস্ত্র গান্ধীজীর পায়ের কাছে সমর্পণ করা হয় এবং চল্লিশজন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতা গান্ধীজীকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন যে কলকাতায় আবার দাঙ্গা হলে তাঁরা তাঁদের জীবন দিয়েও তা রুখবেন। এরপর গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করেন। সেই সময়ে ঐ বাড়িতে কে ছিলেন না? রাজ্যপাল চক্রবর্ত্তী রাজা গোপালাচারি, মুখ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষ, তাঁর মন্ত্রীসভার কিছু সদস্য, হিন্দু মহাসভার এন. সি. চ্যাটার্জী ও দেবেন মুখার্জী (ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী আগেই ঘুরে গেছেন) দেশ দর্পনের সম্পাদক শিখ নেতা সর্দ্দার নিরঞ্জন সিং তালিব, মুসলিম লীগের ডঃ জিলানী ও সাহেব সুরাবর্দ্দী, পাকিস্তান সীমেনস্ ইউনিয়নের ডঃ আবদুর রশিদ চৌধুরী ও মহিবুর রহমান, প্রমুখ। গান্ধীজী ৭৩ ঘন্টা বাদে বৃহস্পতিবার ৪ঠা সেপ্টেম্বর তাঁর অনশন ভঙ্গ করেন সুরাবর্দ্দী সাহেবের অনুরোধে ৯-১৫ মিনিটে।

মহাত্মা গান্ধীর এই শান্তি ও স্বাভাবিকতা ফেরানোর প্রচেষ্টায় অভিভুত হয়ে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ও পরাধীন ভারতবর্ষের শেষ ভাইসরয় লর্ড রবার্ট ল্যুই মাউন্ট ব্যাটেন গান্ধীজীকে স্বহস্তে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটির তারিখ ২৬শে আগস্ট ১৯৪৭। গান্ধীজীর এই কাজকে অভিনন্দিত করে তিনি লেখেন যে একজন সৈনিক হিসাবে ও একজন শাসনকর্তা হিসাবে তিনি কি তাঁর 'ওয়ান ম্যান বাউন্ডারী ফোর্স' বা 'সীমান্তের এক প্রহরী'-কে সেলাম জানাতে পারেন? পাঞ্জাবে পঞ্চান্ন হাজার সৈন্য নিয়েও যা তিনি করতে পারেননি গান্ধীজী একাই তা করলেন - শান্তি ফেরালেন। বস্তুতঃ গান্ধীজীর মৃত্যুর বহু বছর পরেও কলকাতা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় কবলিত হয়নি এবং পশ্চিম বঙ্গের প্রথম রাজ্যপাল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী এটি 'ক্যালকাটা মিরাকর্ল্' বা 'কলকাতার চমৎকারিত্ব' বলে বর্ণনা করেন।

১৯৪৭ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজী দিল্লী যাত্রা করেন। আর কলকাতা ফেরা হয়নি। নোয়াখালির কাজ আর সম্পূর্ণ হয়নি। কারণ ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী বিকাল বেলায় এক অর্বাচীন তাঁকে হত্যা করে। তবে আমার ধারণা গান্ধীজীর কাজকর্ম ও বক্তৃতা কায়েমী স্বার্থের মানুষজনকে সন্ত্রস্ত করেছিল ও তাদেরই শিকার হন গান্ধীজী। সে অবশ্য আর এক কাহিনী।